ইউনিট ৫

বাংলাদেশে প্রধান প্রধান বেসরকারী সমাজসেবা কার্যক্রম

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশ। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বহু দেশী ও বিদেশী বেসরকারী সমাজসেবা-সংস্থাসমূহ বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক জটিল সমস্যাগুলো সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী প্রচেষ্টা পরিপূরক ও ফলপ্রসূ অবদান রাখছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হলঃ

পাঠ ১ ঃ বাংলাদেশে বেসরকারী স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা কর্মসূচীর ধারণা
পাঠ ২ ঃ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি
পাঠ ৩ ঃ বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি
পাঠ ৪ ঃ বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি
পাঠ ৫ ঃ বাংলাদেশ বয়স্কাউট সমিতি
পাঠ ৬ ঃ বাংলাদেশ গার্লস গাইড সমিতি
পাঠ ৭ ঃ গ্রামীণ ব্যাংক
পাঠ ৮ ঃ ব্র্যাক

পাঠ– ১ ঃ বাংলাদেশে বেসরকারী স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা কর্মসূচীর ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ ৫-১:১ বেসরকারী (স্বেচ্ছামূলক) সমাজসেবা সংস্থা কি?
☞ ৫-১:২ বেসরকারী সমাজসেবা সংস্থার পটভূমি কি?

৫.১.১ বেসরকারী (স্বেচ্ছামূলক) সমাজসেবা সংস্থা

বেসরকারী সমাজসেবা বলতে ঐ সকল সমাজসেবাকে বোঝায় যেগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগনের স্বাধীন ইচ্ছা ও নিজস্ব প্রচেষ্টায় সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। বেসরকারী বা স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। যেমনঃ

বেসরকারী (স্বেচ্ছামূলক) সমাজসেবা বলতে আমরা বুঝি "কোন স্বীকৃত কর্মক্ষেত্রে কণ্যাণমূলক সেবা প্রদান করার জন্য জনগনের স্বাধীন ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা গৃহিত কোন পদক্ষেপ এবং এর সম্পদ, জনগনের চাঁদা, দান ও অনুদানের উপর নির্ভরশীল।"

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৬১ অনুযায়ী "কোন সমাসেবা বা কল্যাণমূলক কাজ করার জন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বাধীন ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংগঠন, সমিতি বা কর্মকাণ্ডকেই স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা বলে।"

জনসেবা বা জনকল্যাণের লক্ষ্যে জনগণের স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা ও সহযোগীতায় সংগঠিত সংস্থা, সমিতি বা সংগঠনকে বেসরকারী বা স্বেচ্ছামূলক সংস্থা বলে।

অন্যভাবে বলা যায় সমাজের উন্নয়ন কার্যাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনগনের স্ব-উদ্যোগে গড়ে উঠা সংগঠনই স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নামে পরিচিত। যেমন বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি, বাংলাদেশ বয়েস স্কাউট সমিতি ইত্যাদি।

পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের সমাজকল্যাণ বিভাগের সংজ্ঞানুযায়ী "সমাজের কোন স্বীকৃত ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সংস্থাকে স্বেচ্ছামূলক বা বেসরকারী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান বলা হয়।"

স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের ফাণ্ডের উৎস প্রধানত দুটি- ক) জনগনের চাঁদা, দান ও সরকারী অনুদান এবং খ) বিদেশী অর্থ ও সাহায্য। এসকল সংস্থাসমূহ বেসরকারী সাহায্য-সংস্থা বা NGO হিসেবে পরিচিত।

সাধারণত বেসরকারী (স্বেচ্ছামূলক) সাহায্য সংস্থা সমূহকে প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতার বিবেচনায় চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায় যেমনঃ-

১. স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বিভিন্ন নামের অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক সংস্থা যেমন চাঁদতারা সংঘ, যুব সংঘ, সমাজকল্যাণ সমিতি ইত্যাদি।

২. জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যেমন বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ইত্যাদি।

৩. আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কেয়ার (CARE) ডানিডা, কারিতাস ইত্যাদি।

৪. আঞ্চলিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যেমন ঃ বরিশাল অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে গঠিত বরিশাল সমিতি, নোয়াখালি সমিতি ইত্যাদি।

৫.১.২ বেসরকারী সমাজসেবা সংস্থার পটভূমি

ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিশেষতঃ স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকে ইংরেজি শিক্ষিত তরুণরা রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলেন। সেখান থেকেই এ কার্যক্রমের সূচনা হয়। নিম্নে বেসরকারী কার্যক্রমের পটভূমি আলোচনা করা হলো।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে এদেশে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে ওঠে। তম্মধ্যে ১৯৫৩ সালে গৃহিত পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী ও ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বহুমূত্র সমিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তার পরবর্তি সময়ের প্রেক্ষাপটে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেতৃত্বের প্রাধান্য ছিল এসব সংস্থার মূল বৈশিষ্ট্য। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এ ধরনের স্থানীয় সংস্থার পাশাপাশি কিছু কিছু বিদেশী সংস্থাও দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তথা সমস্যা সমাধানে কাজ করতে দেখা যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্থানীয় সংস্থাগুলো বিভিন্ন জটিল সমস্যায় পড়ে। ফলে বহু বিদেশী সংস্থা তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে আসে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২০ হাজার সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রীভুক্ত। ১ হাজার ৬ শত সংস্থা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রেজিষ্ট্রীভুক্ত। এনজিও ব্যুরো রেজিষ্ট্রীভুক্ত ৮৫০ টি। দারিদ্র বিমোচন, নারী অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নয়নে সংস্থাসমূহ কাজ করছে।

বাংলাদেশে ১৩৫ টি বিদেশী সংস্থা যারা নিজেদের দেশ থেকে আনীত অর্থ ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিনিধি পরিচালক দ্বারা নিজেদের কর্মসূচী পরিচালনা ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে থাকে। বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত দেশী সংস্থার ১,০০০ টি যারা কর্মসূচী পালনের জন্য বিদেশী সহায়তার উপর নির্ভরশীল। দেশীয় যেসব জাতীয় সংস্থা জাতীয়ভাবে কাজ করছে সেসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো হচ্ছে ঃ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি, বাংলাদেশ স্কাউট, গার্লস গাইড সমিতি, গ্রামীণ ব্যাংক, বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক) প্রভৃতি।

সারাংশ

বেসরকারী (স্বেচ্ছামূলক) সমাজসেবা বলতে সেই সকল সমাজসেবাকে বোঝায় যেগুলো জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীন ইচ্ছা, সহযোগীতা ও নিজস্ব প্রচেষ্টায় সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। সরকারী উদ্যোগের বাইরে সমাজের উন্নয়নে জনগণের স্ব-উদ্যোগে গড়ে উঠা সংগঠনই বেসরকারী (স্বেচ্ছামূলক) সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নামে পরিচিত।

সাধারণত বেসরকারী (স্বেচ্ছামূলক) সংস্থা ৪ প্রকার। যেমনঃ- ১. স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ২. জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ৩. আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ৪. আঞ্চলিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিশেষতঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগ থেকে শিক্ষিত তরুণরা রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে এদেশে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর বিচিত্রধর্মী সমস্যা মোকাবেলায় বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে ওঠে। বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রীভুক্ত। এনজিও ব্যুরো রেজিষ্ট্রীভুক্ত ৮৫০ টি। দারিদ্র বিমোচন, নারী অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নয়নে সংস্থাসমূহ কাজ করছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বেসরকারী (স্বেচ্ছামূলক) সমাজসেবা সংস্থা কী?
২. বেসরকারী (স্বেচ্ছামূলক) সমাজসেবা সংস্থা কত প্রকার ও কী কী?

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

পাঠ ৫-১ ১. স্বেচ্ছামূলক সাহায্য সংস্থাসমূহ প্রধানত

ক) ১ প্রকার খ) ২ প্রকার
গ) ৩ প্রকার ঘ) ৪ প্রকার

২. স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস প্রধানত

ক) ১টি খ) ২টি
গ) ৩টি ঘ) ৪টি

শূন্যস্থান পূরণ করুন

পাঠ ৫.১ ১। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় _____ হাজার সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রীভুক্ত।
২। ____ হাজার _____ শত সংস্থা _____ও _____বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রেজিষ্ট্রীভুক্ত।
৩। এনজিও ব্যুরো রেজিষ্ট্রীভুক্ত _____ টি।
৪। বাংলাদেশে বিদেশী সেবা সংস্থা _____ টি।

পাঠ- ২ ঃ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- ☞ ৫-২:১ রেডক্রস বা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি কী?
- ☞ ৫-২:২ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নীতিমালা কী?
- ☞ ৫-২:৩ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম কী?

৫-২:১ রেডক্রস বা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

রেডক্রস বা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি হল বিশ্ব মানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি নিবেদিত আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা। ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে সংগঠিত ১৮৭৯ সালের ভয়াবহ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে বিপন্ন মানবতার সেবার লক্ষ্যে হেনরী ডুন্যান্ট রেডক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত হন। যুদ্ধাহত মানুষের করুণ চিত্র তুলে ধরে হেনরী ডুন্যান্ট বিশ্ব বিবেকের নিকট তাদের সেবার উদ্দেশ্যে একটি সাহায্য সংস্থা গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান। এর ফলশ্রুতিতে ১৬টি দেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১৮৬৩ সালের ২৬ অক্টোবর জেনেভায় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি। ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি এ্যাক্ট ১৯২০ অনুযায়ী এ দেশে প্রথম পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারী বাংলাদেশ সরকারের এক আদেশ বলে বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২০ অক্টোবর আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তেহরান সম্মেলনে বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে এর নতুন নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

৫-২:২ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নীতিমালা

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মৌলিক নীতিমালাগুলো হলো-

১. **মানবতা ঃ** রেডক্রিসেন্ট মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. **পক্ষপাতহীনতা ঃ** পক্ষপাতের উর্দ্ধে থেকে সকলকে সাহায্য করা এর নীতি।

৩. **নিরপেক্ষতা ঃ** রেডক্রিসেন্ট নিরপেক্ষভাবে মানুষের সেবার ব্রত নিয়ে কাজ করে।

৪. **স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ঃ** রেডক্রিসেন্ট জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে।

৫. **স্বেচ্ছামূলক ঃ** এটি একটি স্বেচ্ছামূলক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

৬. **একতা ঃ** একটি দেশে রেডক্রিসেন্টের একটি মাত্র সংগঠন থাকে এবং তা সকল জনগনের জন্য সেবা দেয়।

৭. **সর্বজনীনতা ঃ** রেডক্রিসেন্ট একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজের মানুষের সমান অধিকার এবং একে অপরকে সাহায্য করার নীতিতে বিশ্বাসী।

৫-২:৩ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট ১৯৪৯ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি' নামে আত্মপ্রকাশ করে। যার নাম ১৯৭১ সালে পরিবর্তন করে রাখা হয় 'বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি'। বর্তমানে (১৯৮৮ সাল থেকে) এর নাম 'বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি'। বৃহত্তর দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) ত্রাণ ও পূনর্বাসন (খ) স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ (গ) দুর্যোগ প্রতিরোধ (ঘ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং (ঙ) যুব রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রম।

সর্বোপরি রেডক্রিসেন্ট সমিতি যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো -

১। **চিকিৎসাক্ষেত্রে ঃ** চিকিৎসাক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভূমিকা অনন্য। দেশের সকল এলাকার জনগণকে চিকিৎসার সুযোগ দানের জন্য এ সংস্থা বিনামূল্যে ঔষধ, পথ্য ও খাদ্য সরবরাহ সহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

২। **খাদ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ঃ** জনগনকে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করার জন্য 'জরুরী সম্পূরক খাদ্য সংস্থান' নামে একটি কর্মসূচী পরিচালনা করে। ১৩ শতেরও অধিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে জনগনকে জরুরী খাদ্য সরবরাহ করে থাকে।

৩। **ত্রাণ ও সাহায্য ক্ষেত্রে ঃ** বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জরুরী পরিস্থিতিতে বিশেষ করে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, মহামারি, যুদ্ধ, প্রভৃতি পরিস্থিতিতে এ সংস্থার অবদান সবচেয়ে বেশী।

৪। **পুনর্বাসন ক্ষেত্রে ঃ** বাংলাদেশে দুস্থ ও এতিম শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য এ সংস্থা কয়েকটি এতিমখানা পরিচালনা করে। তাছাড়া পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা ও বীরঙ্গনাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও এ সংস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ন।

৫। **অবাঙালিদের সাহায্য কর্মসূচী ঃ** স্বাধীনতার পরে এদেশে অবস্থানরত প্রায় ১০ লক্ষ অবাঙালিকে চিকিৎসা সুযোগ, শিশুখাদ্য এবং খাদ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভুমিকা উল্লেখযোগ্য।

৬। **রক্ত, কর্ণিয়া ও কিডনী সংগ্রহ ঃ** চিকিৎসা ক্ষেত্রে জরুরীভিত্তিতে দুস্হ অসহায়দের সাহায্যার্থে সরবরাহ করার জন্য রেডক্রিসেন্ট সারাদেশে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতদের কাছ থেকে রক্ত, চক্ষুর কর্ণিয়া ও কিডনী সংগ্রহ করে থাকে।

৭। **হাসপাতাল কর্মসূচী ঃ** বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট চিকিৎসাক্ষেত্রে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে নিজস্ব হাসপাতাল পরিচালনা করে। এই পরিচালিত হাসপাতালটি হলো বাংলাদেশের বিখ্যাত হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল।

৮। **এম্বুলেন্স কর্মসূচী ঃ** নিজস্ব হাসপাতালের জন্য এবং অন্যান্য মুমূর্ষ রোগীদের আনা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্টের প্রায় ৫০ টি এম্বুলেন্স আছে।

৯। **জরুরী চিকিৎসা ঃ** জরুরী চিকিৎসা সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ৭টি ভ্রাম্যমান ইউনিট ও ৬টি ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনা করে থাকে।

১০। **ধাত্রী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ** প্রসবকালীন মৃত্যুহার রোধকল্পে এ সমিতি ধাত্রী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করে।

১১। **মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কর্মসূচী ঃ** ২৩ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে এ সমিতি গ্রামীণ মায়েদের স্বাস্থ্য এবং শিশু যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

১২। **স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচী ঃ** জনগনকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সোসাইটি স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে।

১৩। **যুব রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রম ঃ** বাংলাদেশের কিশোর ও যুব সমাজকে আর্ত মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ করে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১৪। **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ** সমিতির কর্মকর্তা, যুব রেডক্রিসেন্ট সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক যুব সমাজ এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

১৫। **প্রাক দুর্যোগ পাইলট প্রকল্প ঃ** উপকূলীয় এলাকার জনগনকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আশ্রয় দানের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে এই প্রকল্প চালু করা হয়। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ১৯৬৯ সালে কক্সবাজারে একটি রাডার কেন্দ্র স্থাপন সহ ১৬টি বেতার কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

সারাংশ

রেডক্রস বা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি হল বিশ্ব মানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা। ১৮৬৩ সালের ২৬ অক্টোবর হেনরী ডুন্যান্ট এর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি এ্যাক্ট ১৯২০ অনুযায়ী এ দেশে প্রথম পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারী বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২০ অক্টোবর বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি পূর্ণ স্বীকৃতি অর্জন করে। বর্তমানে বাংলাদেশে এর নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি করা হয়। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মৌলিক নীতিমালাসমূহ হল মানবতা, নিরপেক্ষতা স্বাধীনতা, স্বেচ্ছামূলকতা, সর্বজনীনতা, একতা ও শান্তি।

বিপন্ন মানবতার সেবায় সর্বোপরি বর্তমানে বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি যে কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছে সেগুলো হলো ঃ ১। চিকিৎসা কার্যক্রম, ২। খাদ্য কর্মসূচী, ৩। ত্রাণ ও সাহায্য কার্যক্রম, ৪। পুনর্বাসন কার্যক্রম, ৫। অবাঙালিদের সাহায্য কর্মসূচী, ৬। রক্ত কর্ণিয়া ও কিডনী সংগ্রহ কর্মসূচী, ৭। হাসপাতাল কর্মসূচী, ৮। এম্বুলেন্স কর্মসূচী, ৯। জরুরী চিকিৎসা কার্যক্রম, ১০। ধাত্রী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, ১১। মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কর্মসূচী, ১২। স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচী, ১৩। যুব রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রম, ১৪। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, ১৫। প্রাক দুর্যোগ পাইলট প্রকল্প।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইহা সমাজ সেবার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখছে যা সরকারী কার্যক্রমকে অতিক্রম করে ফেলেছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রেডক্রস বা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি কী?

২. বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নীতিমালা কী?

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

পাঠ ৫-২ ১. আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন কে?

ক) রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল খ) ফ্লুরেন্স নাইটিংগেল

গ) হেনরী ফোলার ঘ) হেনরী ডুন্যান্ট

২. বাংলাদেশে কখন রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয়

ক) ১৯৭১ সালের ১৫ই জানুয়ারী খ) ১৯৭২ সালের ৪ই জানুয়ারী

গ) ১৯৭২ সালের ২৪ই জানুয়ারী ঘ) ১৯৭৩ সালের ৪ই জানুয়ারী

পাঠ- ৩ ঃ বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ ৫-৩:১ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির পরিচয়
- ☞ ৫-৩:২ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির লক্ষ্য
- ☞ ৫-৩:৩ বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো
- ☞ ৫-৩:৪ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির কার্যক্রম

৫-৩:১ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির পরিচয়

বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ১৯৫৩ সালের ২ মার্চ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপিকা ডা. হুমায়রা-সাঈদ এর উদ্যোগে এবং ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, আলমগীর কবীর প্রমূখ সমাজসেবীদের সহযোগীতায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে এ সমিতি International Planned Parenthood Fedaration (IPPF) এর সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৬৪ সালে নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে দেশীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমিতি স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭২ সালে সমিতির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি নাম রাখা হয়। এটি পরবর্তিতে IPPF এর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করে। বর্তমানে এ সমিতি বাংলাদেশ সরকারের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা জনসংখ্যা স্ফীতির মোকাবেলায় সরকারী কর্মসূচীর পরিপূরক ও সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সুতরাং বলা যায় ১৯৫৩ সালে বেসরকারী উদ্যোগে শুরু হয়ে অদ্যাবধি বাংলাদেশের জনসংখ্যা স্ফীতি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবার পরিকল্পনাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যে সংস্থাটি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে তারই নাম বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি।

৫-৩:২ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির লক্ষ্য

বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির ঘোষণা পত্রে যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপঃ

১। পরিবার কল্যাণের লক্ষ্য মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান দান।
২। জাতীয় স্বার্থে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সুফল কুফল সম্পর্কে প্রচার।
৩। পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপক প্রসারের জন্য জেলায় জেলায় ক্লিনিক্যাল সেবা প্রদান ও চিকিৎসা নিশ্চয়তা।
৪। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে নিয়োজিত কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন।
৬। জন্মনিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামের সঠিক ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্পর্কিত শিক্ষাদান।
৭। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে উৎসাহ প্রদান।
৮। পরিবার পরিকল্পনা কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নিরূপণ ও সমাধানে সহায়তা দান।
৯। সমিতির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শাখা প্রতিষ্ঠিত করা।
১০। সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

সর্বোপরি বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর জীবনমান উন্নয়ন এবং জনগণকে ছোট পরিবার গঠনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা।

৫-৩:৩ বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২৭ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কার্যনিবাহী কমিটি নিয়োজিত রয়েছে। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী সমিতির সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ২৮৭৯ জন। সমিতির জেলা পর্যায়ে রেয়েছে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যনির্বাহি কমিটি (District Exicutive Committee)। সমিতির একটি জাতীয় কাউন্সিল রয়েছে। যাতে প্রত্যেক জেলা থেকে তিনজন প্রতিনিধি থাকে। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে একজন প্রেসিডেন্ট, চার জন ভাইস প্রেসিডেন্ট, একজন সেক্রেটারি জেনারেল, একজন ট্রেজারার, একজন এসিসট্যান্ট সেক্রেটারি এবং চারজন সেক্রেটারি ও পনর জন সদস্য থাকেন। জেলা কার্যনির্বাহী কমিটিতে একজন প্রেসিডেন্ট দুইজন ভিপি, একজন জেনারেল সেক্রেটারি, একজন ট্রেজারার, চারজন সেক্রেটারি ও পাঁচজন সদস্য থাকে।

৫-৩:৪ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির কার্যক্রম

বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে তা নিম্নরূপঃ

১। **মেডিকেল কার্যক্রম ঃ** ১৯৫৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগে শুরু হয়ে এ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে দেশের ৩৯ টি সরকারী হাসপাতালে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সমিতি ২০ টি বৃহত্তর জেলায় ২০টি স্বয়ং সম্পূর্ণ নিজস্ব ক্লিনিক পরিচালনা করছে। এগুলোর মাধ্যমে সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা ছাড়াও মাতৃমঙ্গল ও প্রতিষেধক টিকা, ইনজেকশন দেয়া হয়।

২। **পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান এবং মাতৃমঙ্গল এবং শিশুকল্যাণ কার্যক্রম ঃ** এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সেবা প্রদান ও জীবন মান উন্নত করা এবং ছোট ও সুন্দর পরিবার গঠনে সহযোগীতা করা।

৩। **পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ঃ** গ্রামাঞ্চলের নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে এ কার্যক্রম শুরু হয়। যার প্রাথমিক নাম ছিল সুখী পরিবার ক্লাব। বর্তমানে সক্রিয়ভাবে পরিচালিত কেন্দ্রের সংখ্যা ৬০।

৪। **যুব প্রকল্প ঃ** ১৯৭৭ সালে গৃহীত প্রকল্পে যুবক ও কিশোরদের স্বাক্ষরতা, ছোটখাট হিসাবনিকাশ শিক্ষা, দায়িত্বশীল পিতৃত্ব-মাতৃত্ব, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, পারিবারিক জীবন, আত্মকর্মসংস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।

৫। **গবেষণা কার্যক্রম ঃ** পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে 'ইসলামী গবেষণা সেল' গঠন করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুর যত্ন বিষয়ে কুরআন হাদিসের আলোকে গবেষণা, পরিকল্পনা এবং গবেষণালব্ধ তথ্য সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া এ সেলের প্রধান কাজ।

৬। **গণযোগাযোগ কার্যক্রম ঃ** এটি সমিতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। জনসংখ্যা স্ফীতির পরিণাম এবং পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে জনসভা, সেমিনার, আলোচনা সভা অনুষ্ঠান, দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনার পক্ষ পালন (ডিসেম্বর ১৯৯৩) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭। **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ** পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন এবং জনগণকে দক্ষতার সঙ্গে উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান সমিতির নিয়মিত কার্যক্রমের অপরিহার্য অঙ্গ।

৮। **প্রচার ঃ** সমিতি পরিকল্পিত পরিবার গঠনেজনগণকে উৎসাহিত ও সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৯। **জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ ঃ** সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা হতে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করে পরিবার পরিকল্পনায় কর্মরত সংস্থাগুলোকে সহায়তা প্রদান সমিতির অন্যতম কর্মসূচী।

১০। **অর্থনৈতিক কার্যক্রম ঃ** অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাই সমিতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় সামাজিক ও ধর্মীয় বাঁধা বিপত্তি সত্ত্বেও পরিবার পরিকল্পনা সমিতির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য যথার্থই প্রশংসনীয়। তাই এর ব্যাপক সম্প্রসারণও কাম্য।

সারাংশ

পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অতি পুরাতন ও বেসরকারী সংস্থা হলো বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি। সংস্থাটি কেবল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ শিশু ও মাতৃকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও গবেষণা সহ জনগণের জীবনমানের উন্নয়নে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক আলমগীর কবিরের সহযোগীতায় তদানীন্তন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মিসেস হোমায়রা সাঈদের নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালের ২ মার্চ এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটির লক্ষ্য হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য জ্ঞান দান, পরিবার পরিকল্পনা কাজে নিয়োজিত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে গবেষণা ও মূল্যায়ন, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার ও স্বনির্ভরতা অর্জন ইত্যাদি। এর সাংগঠনিক কাঠামো হলো জাতীয় কার্যনিবাহী কমিটিতে একজন প্রেসিডেন্ট, চার জন ভাইস প্রেসিডেন্ট, একজন সেক্রেটারি জেনারেল, একজন ট্রেজারার, একজন এসিসট্যান্ট সেক্রেটারি এবং চারজন সেক্রেটারি ও পনর জন সদস্য থাকেন। বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্যে আছে মেডিকেল কার্যক্রম, পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান, যুব প্রকল্প, গবেষণা কার্যক্রম, গণযোগাযোগ কার্যক্রম, জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, ইসলামী গবেষণা সেল, প্রচার কার্যক্রম, উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম ও মূল্যায়ন কার্যক্রম ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরিবার পরিকল্পনা সমিতি কী?
২. পরিবার পরিকল্পনা সমিতির লক্ষ্য কী?
৩. বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো কী?

সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

পাঠ ৫-৩ ১। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ১৯৫৩ সালের ২ মার্চ গঠিত হয়।
২। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২৯ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কার্যনির্বাহি কমিটি নিয়োজিত রয়েছে।
৩। ১৯৫৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেডিকেল কার্যক্রম শুরু হয়।

পাঠ ৪ ঃ বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ ৫-৪:১ বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি কী?
- ☞ ৫-৪:২ বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতির লক্ষ্য কী?
- ☞ ৫-৪:৩ ডায়াবেটিস রোগের নমুনা ও লক্ষণ কী?
- ☞ ৫-৪:৪ বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি কার্যক্রম কী?

৫-৪:১ বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতির পরিচয়

বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি বহুমূত্র রোগীদের কল্যাণে পরিচালিত একটি জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম এবং কয়েকজন সমাজহিতৈষী ব্যক্তির আন্তরিক ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৫৬ সালের ১ মার্চ 'ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর এর নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি' রাখা হয়।

১৯৫৭ সালে ঢাকার সেগুন বাগিচায় স্বল্প পরিসরে এর কাজ চালু হলেও ১৯৮৯ সালে শাহবাগে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল সহ বহুতল বিশিষ্ট একটি বহুমূত্র চিকিৎসা কমপ্লেক্স গড়ে ওঠেছে। ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর এর নামকরণ করা হয় ইব্রাহিম মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক সেন্টার।

বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। ২৬ সদস্যবিশিষ্ট এর একটি জাতীয় কাউন্সিল আছে। ৩জন সরকারী প্রতিনিধি ছাড়া বাকী অন্যান্য সদস্য সমাজের বিভিন্ন শিক্ষিত নিবেদিত প্রাণ সমাজসেবী। জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে আমৃত্যু কাজ করে গিয়েছেন। সমিতির স্বেচ্ছাকর্মী ও কর্মকর্তা ছাড়া প্রায় ৪৫০ জন চিকিৎসক, সমাজকর্মী, গবেষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন। বর্তমানে সারাদেশে জেলা পর্যায়ে এর ৪১ টি শাখা রয়েছে।

বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতির আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে সরকারী আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ও ব্যক্তিগত অনুদান, বিদেশী সংস্থার দান, লটারী অনুষ্ঠান ইত্যাদি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। তাছাড়া বহুমূত্র রোগীদের পুণর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকেও অনুদান দেয়া হয়।

৫-৪:২ বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতির লক্ষ্য

বাংলাদেশে বহুমূত্র রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্য বাসতবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করছে সেগুলো নিম্নরূপ।

১। বহুমূত্র রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।
২। প্রশিক্ষণ, শিক্ষার প্রসার ও প্রচারণার মাধ্যমে রোগ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।
৩। দরিদ্র অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পুণর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
৪। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সহজতর ও এর মানোন্নয়ের লক্ষ্যে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা।
৫। বহুমূত্র রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা।
৬। চিকিৎসা লাভে জনগণকে উৎসাহিত করা।
৭। বহুমূত্র ও তৎসম্পর্কিত রোগ সম্পর্কে সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ দান।

৫-৪:৩ ডায়াবেটিস রোগের নমুনা ও লক্ষণ

ডায়াবেটিসের বাংলা নাম বহুমূত্র । বহুমূত্র এমন একটি রোগ যা মানব দেহের অন্তক্ষরা গ্রন্থি (Ductless gland) অগ্নাশয়ের (puncreas) অকার্যকারিতার জন্য সৃষ্টি হয়। অগ্নাশয় এমন এক ধরণের হরমোন সৃষ্টি করে যার নাম ইনসুলিন। ইনসুলিনের প্রধান কাজ হচ্ছে খাদ্য থেকে শক্তি উৎপাদন করা। কোন কারণে প্রয়োজনীয় ইনসুলিন সৃষ্টি না হলে খাদ্যদ্রব্যগুলো চিনির আকারে প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে যায়। ফলে রোগী দিন দিন দুর্বল হয়ে অন্যান্য নানাবিধ রোগে

আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইনসুলিনের কারণে রক্ত ও প্রস্রাবের সাথে চিনি বের হয়ে যাওয়াকেই মূলত বহুমূত্র (Diabetes) বলে। সাধারণত খাদ্যাভ্যাস, পেশাগত কাজের ধরণ, মানসিক দুশ্চিন্তা, পরিবেশ, বংশগতি ইত্যাদি কারণে বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হয়। ডায়াবেটিস আজীবনের রোগ। (Once Diabetes always a Diabetes) তবে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ঔষধ সেবন এবং নিয়মানুবর্তিতা (diet, drug and discipline) এর মাধ্যমে খুব ভালভাবে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ডায়াবেটিক রোগের লক্ষণ সমূহ হলোঃ

ঘন ঘন প্রস্রাব করা, রাতে ঘুম থেকে উঠে বারবার প্রস্রাব করা, ঘন ঘন পিপাসা, অতিরিক্ত ক্ষুধা লাগা, অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়া, শরীরের ওজন কমে যাওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, জনন অংগের আশেপাশে চুলকানি হওয়া, সহজে কোন ক্ষত না শুকানো ইত্যাদি।

৫-৪:৪ বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতির কার্যক্রম

বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম পালন করছে ।

১। **প্রচার ও প্রকাশনা ঃ** বহুমূত্র রোগের কারণ, এর প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার জন্য বহুমূত্র সমিতি বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এ সকল পদক্ষেপের মধ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন, বুকলেট সহ রেডিও, টি.ভি. ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহার।

২। **চিকিৎসা সেবা ঃ** বহুমূত্র রোগীদের চিকিৎসা, রোগ নির্ণয়, ওষুধ সরবরাহ, প্রয়োজনীয় পরামর্শ, এবং দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

৩। **হাসপাতাল সেবা কর্মসূচী ঃ** একটি পনের ও একটি তিনতলা বিশিষ্ট ভবনে হাসপাতাল সেবা কর্মসূচী বিস্তৃত যেখানে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা ও সেবার কাজ করা হয়।

৪। **প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ** গ্রামীণ পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মসূচী সফল করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে।

৫। **পুনর্বাসন কর্মসূচী ঃ** দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র রোগীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সহ সমিতির বিভিন্ন প্রকল্পে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

৬। **উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী ঃ** বহুমূত্র রোগীদের সাথে আলোচনা সভা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ পরামর্শ দান, দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ প্রদান, অনিয়মিত রোগীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, রোগীদের অনুসরণ (Follow up) করা প্রভৃতির মাধ্যমে চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় রোগীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়।

৭। **গবেষণা কার্যক্রম ঃ** সমিতি বহুমূত্র রোগের উৎপত্তি, বিভিন্ন কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য গবেষণা কাজ পরিচালনা করে থাকে।

৮। **বারটান (BIRTAN) ঃ** ১৯৬৮ সালে সমিতি জুরাইনে একটি ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বনিম্ন পুষ্টি গ্রহণের নিশ্চয়তা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

৯। **ক্লিনিক্যাল সার্ভিস ঃ** এ বিভাগের মাধ্যমে রেজিষ্টার্ড ডায়াবেটিক রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যজ্ঞান এবং সচেতনতা প্রদান করা হয়।

১০। **বহির্বিভাগ চিকিৎসা সেবা ঃ** এ বিভাগ থেকে প্রতিদিন নতুন ও পুরনো রোগী চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে থাকে। এদের সংখ্যা প্রতি বছর বেড়ে চলেছে।

১১। **খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগ ঃ** এ বিভাগ ডায়াবেটিক রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনকে খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানদান করে থাকে। এছাড়াও বারডেম হাসপাতালের রান্নার তদারকি ও পরিকল্পনায় সহায়তা করে।

১২। **ন্যাশনাল ডায়াগনেষ্টিক নেটওয়ার্ক বা এনডিএন ঃ** বারডেমের সুযোগ সুবিধাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য NDN বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে সেবা কর্মসূচীকে সফল করে তুলেছে। উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রগুলো হচ্ছে মিরপুর, পান্থপথ, জুরাইন, ওয়ারী, কেরানীগঞ্জ, উত্তরা, গুলশান ও ধানমণ্ডি কেন্দ্র।

১৩। **এক্সিকিউটিভ হেল্‌থ চেক সেন্টার ঃ** সোনারগাঁ রোডে অবস্থিত এ কেন্দ্রে মূলত অভিজাত শ্রেণীর রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। এটি ঘউঘ এর অধীনে ১৯৯৬ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বর্তমানে প্রায় ১০ লাখ ডায়াবেটিক রোগী রয়েছে। বারডেম কেন্দ্রীয় হাসপাতাল ও দেশের ৪১ টি ডায়াবেটিক চিকিৎসা কেন্দ্রে মাত্র ১০ ভাগ রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি ও ডায়াবেটিক রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি না হলে আগামী দশকে ৪০ লাখ ডায়াবেটিক রোগীর চিকিৎসায় মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হবে।

সারাংশ

বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি একটি জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম এর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৫৬ সালে'ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর এই সমিতির নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি'।

বর্তমানে শাহবাগে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল সহ বহুতল বিশিষ্ট একটি বহুমূত্র চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে ওঠেছে। এই সমিতির লক্ষ্য হলো ঃ বহুমূত্র রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা, দরিদ্র অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পুণর্বাসনের ব্যবস্থা করা, চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সহজতর ও এর মানোন্নয়ের লক্ষ্যে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা, বহুমূত্র রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা, চিকিৎসা লাভে জনগণকে উৎসাহিত করা ও বহুমূত্র ও তৎসম্পর্কিত রোগ সম্পর্কে সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি।

ডায়াবেটিক রোগের লক্ষণ হলো ঘন ঘন প্রস্রাব করা, অতি পানি পিপাসা, অতিরিক্ত ক্ষুধা লাগা, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ করা, শরীরের ওজন হ্রাস, চোখে ঝাপসা দেখা, জনন অংগের আশেপাশে চুলকানি হওয়া এবং সহজে কোন ক্ষত না শুকানো ইত্যাদি।

বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতির সাংগঠনিক কাঠামোর রূপরেখা হলো ২৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় কাউন্সিল। ৩ জন সরকারী প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সদস্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষিত নিবেদিত প্রাণ সমাজসেবী। সমিতির কিছু স্বেচ্ছাকর্মী ও কর্মকর্তা ছাড়া প্রায় ৪৫০ জন চিকিৎসক, সমাজকর্মী, গবেষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে। বর্তমানে সারাদেশে জেলা পর্যায়ে এর ৪১ টি শাখা আছে।

বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতির কার্যক্রম গুলো হলো ঃ প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম, চিকিৎসা সেবা, হাসপাতাল সেবা কর্মসূচী, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, পুনর্বাসন কার্যক্রম, উদ্ধুদ্ধকরণ কর্মসূচী, গবেষণা কার্যক্রম, ক্লিনিক্যাল সার্ভিস, বহির্বিভাগ চিকিৎসা সেবা, খাদ্য ও পুষ্টি সেবা, ন্যাশনাল ডায়াগনেষ্টিক নেটওয়ার্ক, এক্সিকিউটিভ হেল্‌থ চেক সেন্টার ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতির পরিচয় দিন।
২. বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতির লক্ষ্য কি?
৩. বহুমূত্র রোগের নমুনা ও লক্ষণ কি?

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। ____এবং কয়েকজন সমাজহিতৈষী ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টায় ____ সালের ___ ই মার্চ_____প্রতিষ্ঠিত হয় 'ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন অব পাকিস্তান'।
২। _____ সদস্যবিশিষ্ট এর একটি _____ আছে।
৩। বর্তমানে _____ জেলা পর্যায়ে এর _____ টি শাখা আছে।
৪। সাধারণত _____ ইত্যাদি কারণে বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হয়।
৫। ডায়াবেটিস _____। তবে ____ এবং _____ এর মাধ্যমে _____ এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

পাঠ- ৫ ঃ বাংলাদেশ বয়স্কাউট সমিতি (Bangladesh boyscouts)

বাংলাদেশ বয়স্কাউট আন্দোলনের পটভূমি

বৃটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯১০ সালে স্কাউট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। অবিভক্ত ভারতে এই আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯১৮ সালে এ্যানিবেসান্টের উদ্যোগে ভারতীয় স্কাউট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। পরবর্তিকালে ১৯২০ সালে Bengal boy scouts association গঠনের মাধ্যমে এদেশে স্কাউট আন্দোলন সংগঠিত রূপ লাভ করে। ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৮ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে 'পূর্ব পাকিস্তান স্কাউট সমিতি' গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এর নতুন নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি। ১৯৭৪ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত "বিশ্ব স্কাউট সংস্থার কনফারেন্স" এ বাংলাদেশ স্কাউট সমিতিকে 'বিশ্ব স্কাউট সংস্থার ১০৫ তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালে কোপেনহেগেন এ অনুষ্ঠিত পঁচিশতম বিশ্ব স্কাউট সম্মেলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়। বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে বাংলাদেশ স্কাউট সমিতির নতুন নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ স্কাউটস। এটা বিশ্ব স্কাউটস সংস্থার এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি জাতীয় সংগঠন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ ৫-৫:১ স্কাউটিং কি বলতে পারবেন।
- ☞ ৫-৫:২ স্কাউটিং এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ☞ ৫-৫:৩ বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্তর বিভাগের ধারণা দিতে পারবেন।
- ☞ ৫-৫:৪ বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিজ্ঞা বলতে পারবেন।
- ☞ ৫-৫:৫ বাংলাদেশ স্কাউটস এর মূলমন্ত্র তুলে ধরতে পারবেন।
- ☞ ৫-৫:৬ বাংলাদেশ স্কাউটস এর আইন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- ☞ ৫-৫:৭ বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাংগঠনিক কাঠামো বলতে পারবেন।
- ☞ ৫-৫:৮ বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ☞ ৫-৫:৯ বাংলাদেশ স্কাউটস এর কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

৫-৫:১ স্কাউটিং কি

স্কাউটিং হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম বহির্ভূত এমন একটি অরাজনৈতিক আন্দোলন, যা শিশু, কিশোর ও যুব সমাজকে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। অন্যভাবে বলা যায় আনন্দময় প্রশিক্ষণের সহায়তায় শিশু কিশোর ও যুবকদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে একজন উত্তম মানুষ, দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ সেবক এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য সুভ্রাতৃত্বের আদর্শরূপে তৈরী করার প্রক্রিয়াই স্কাউটিং।

৫-৫:২ স্কাউটিং এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য

স্কাউট আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আনন্দময় ও বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্কাউটদের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে চরিত্রবান, দেশ ও জাতির জন্য নিবেদিতপ্রাণ সেবক এবং তাদের মাঝে বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা।

বাংলাদেশ স্কাউটের যে সকল প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১. স্কাউটদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, দিকের বিকাশ সাধন করে আত্মনির্ভরশীল কর্তব্যপরায়ণ, চরিত্রবান ও কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
২. জাতি-ধর্ম-বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে জনগণের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচী ও সেবা প্রদান করা।
৩. কর্মসূচীর সুষ্ঠু পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান করা।
৪. স্রষ্টার প্রতি, দেশের প্রতি এবং স্কাউট আইনের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন এবং সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করা।
৫. স্কাউটদের চারিত্রিক ও মানসিক বিকাশ উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৬. দলীয় জীবনযাপনের গুরুত্ব অনুধাবন এবং নেতৃত্বের বিকাশ ও শৃংখলাবোধ জাগ্রত করতে স্কাউটদের সহায়তা করা।

৭. উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে স্কাউটদের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা।

৫-৫:৩ বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্তর বিভাগ

বয়সের উপর ভিত্তি করে স্কাউটসের তিনটি স্তর বিভাগ রয়েছেঃ

(১) কাব স্কাউট ঃ ৬ থেকে ১১ বছর বয়সী প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে ছেলেদের নিয়ে কাব স্কাউট গঠিত।
(২) বয়স্কাউট ঃ ১১ বছর থেকে ১৬ বছর বয়সী ছেলেদের নিয়ে বয়স্কাউট গঠিত। মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে প্রধানত বয়স্কাউট গঠিত।
(৩) রোভার স্কাউট ঃ সাধারণত ১৬ বছর হতে ২৫ বছরের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে রোভার স্কাউট গঠিত হয়।

৫-৫:৪ বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিজ্ঞা

স্কাউটস এর প্রতিজ্ঞা হলোঃ

(১) স্রষ্টা এবং নিজের দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করা।
(২) সমাজের দুঃস্থ ও অসুবিধাগ্রস্ত মানুষকে সেবা করা।
(৩) স্কাউট আইনসমূহ মেনে চলা।

৫-৫:৫ বাংলাদেশ স্কাউটস এর মূলমন্ত্র

তিনশ্রেণীর স্কাউটদের আলাদা আলাদা মূলমন্ত্র রয়েছে। যেমনঃ

(১) কাব স্কাউট মূলমন্ত্র ঃ 'সাধ্যমত চেষ্টা করা'।
(২) বয়স্কাউট মূলমন্ত্র ঃ 'সদা প্রস্তুত থাকা'।
(৩) রোভার স্কাউট মূলমন্ত্র ঃ 'সেবা প্রদান করা'।

রোভার স্কাউটদের মূলমন্ত্র অর্থাৎ সেবা প্রদান করাকে স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল আবার তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমনঃ (ক) আত্মসেবা (খ) স্কাউট আন্দোলন সেবা (গ) সমাজসেবা।

৫-৫:৬ স্কাউট আইন

যে সকল মূল আদর্শ তথা মূল্যবোধ কে কেন্দ্র করে সমগ্র স্কাউটিং প্রক্রিয়া পরিচালিত সেগুলোকেই স্কাউট আইন বলে। এটা স্কাউট আইনের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। আইনগুলো হচ্ছেঃ (ক) স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী; (খ) স্কাউট সকলের বন্ধু (গ) স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত; (ঘ) স্কাউট জীবের প্রতি সদয়; (ঙ) স্কাউট সদা প্রফুল্ল (চ) স্কাউট মিতব্যয়ী; এবং (ছ) স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

তবে কাব স্কাউটদের জন্য ভিন্ন দুটি আইন রয়েছে যেমন (ক) বড়দের কথা মেনে চলা, (খ) নিজেদের খেয়ালে কিছু না করা।

৫-৫:৭ বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাংগঠনিক কাঠামোর তিনটি স্তর রয়েছে। এগুলো হলো ঃ (১) জাতীয় কাউন্সিল (২) আঞ্চলিক কাউন্সিল (৩) জেলা কাউন্সিল।

প্রতিটি স্তরের একটি কার্যনির্বাহি কমিটি রয়েছে। এগুলো হলো ঃ (১) জাতীয় কার্য নির্বাহি কমিটি (২) আঞ্চলিক কার্য নির্বাহি কমিটি (৩) জেলা কার্য নির্বাহি কমিটি।

বাংলাদেশ স্কাউটস ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত। অঞ্চলগুলো হলো ঃ (১) রাজশাহী (২) খুলনা (৩) ঢাকা (৪) চট্টগ্রাম, (৫) এয়ার, (৬) রেলওয়ে, (৭) রোভার (৮) সী বা নৌ অঞ্চল।

৫-৫:৮ বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভূমিকা

শিশু, কিশোর ও যুবকদের সার্বিক উন্নয়ন তথা চারিত্রিক উৎকর্ষ বিধানের জন্য আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং সমাজের কল্যাণে তাদের অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্কাউটিং নিম্নোক্ত কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকে।

১. স্কাউটস প্রতিজ্ঞা ও আইন দৈনন্দিন সকল কাজে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করা।

২. পর্যায়ক্রমে ব্যাজ ট্রেনিং এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জনে সহায়তা করা।

৩. পেট্রোল সিস্টেম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকলের সঙ্গে সংযোগ ও সহযোগীতার যোগ্যতা এবং সামাজিক নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।

৪. দলীয় জীবনে শৃঙ্খলা এবং বিভিন্ন কলা কৌশল শিক্ষা দানের জন্য জাম্বুরী, মুট ও তাবুবাসের আয়োজন করা।

৫. মুক্তাঙ্গন কার্যাবলীর মাধ্যমে জীবন্ত ও কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণে সহায়তা করা।

৬. কৌতুকী খেলাধুলা এবং আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা।

৭. সমাজসেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ উদ্ধার কার্য, দুর্ভিক্ষে রিলিফ বিতরণ, মহামারীর সময় টিকা ইনজেকশন দান, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা।

৮. হস্তশিল্প ও অন্যান্য সৃষ্টিধর্মী কাজের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

৯. জাতীয় স্কাউট পতাকা উত্তোলন, পতাকার মর্যাদা, জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ভিত্তিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্কাউটদের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা।

১০. পরিচ্ছন্ন ও উত্তম পোশাক পরিধানে উৎসাহ দান এবং নিয়মিত ট্রেনিং এর মাধ্যমে তাদের অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে কর্মতৎপর, নিয়মানুবর্তী এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে সাহায্য করা।

১১. প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পাঠ অনুশীলনের মাধ্যমে বিশ্ব রহস্য জানতে ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে সহায়তা করা।

১২. স্কাউটস প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কোর্স পরিচালনা করা যেমন -দড়ির কাজ, ফাষ্ট এইড।

১৩. জাতীয় অনুষ্ঠানসমূহে শারীরিক কসরৎ প্রদর্শন।

১৪. স্কাউট পরিচিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, পুস্তকাদি প্রকাশ ও বেতার- টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করা।

১৫. স্কাউটদের হাতে কলমে শিক্ষা লাভের জন্য ছোট ছোট উপার্জনশীল প্রকল্প হাতে নেয়া।

১৬. বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলা বিধানে সহায়তা করা।

৫-৫:৯ বাংলাদেশ স্কাউটস এর কার্যাবলী

স্কাউটিং দেশ, জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে শিশু কিশোর ও যুবকদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে দেশের সুনাগরিক হিসেবে তাদের গড়ে তোলে। বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস শিশু কিশোর যুবকদের সার্বিক কল্যাণে এবং দেশের প্রয়োজনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

১। **স্কাউট আন্দোলনের প্রসার ঃ** বাংলাদেশ স্কাউটস দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কাউটের ইউনিট খোলার জন্য বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের স্কাউটসের উদ্যোগে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় স্কাউটিং বাধ্যতামূলক করেছেন।

২। **দলীয় জীবনে শিক্ষা কার্যক্রম ঃ** শিক্ষা জীবনের স্কাউটিং বেশির ভাগই দলভিত্তিক। গঠনমূলক দলীয় জীবনের মাধ্যমে পারস্পরিক সমঝোতা, সুসম্পর্ক স্থাপন এবং সহযোগীতা বৃদ্ধির জন্য স্কাউটিং বার্ষিক তাবু বাসের ব্যবস্থা করে থাকে।

৩। **দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক গড়ে তোলা ঃ** স্কাউটিং এ যুব-কিশোর-শিশুদের নানা রকম শিক্ষাদীক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৪। **স্বাস্থ্য কার্যক্রম ঃ** নিয়মিত শরীরচর্চা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়।

৫। **জনসেবা কার্যক্রম ঃ** ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুর্যোগ ও জাতীয় জরুরি পরিস্থিতিতে স্কাউটগণ সেবা প্রদান করে থাকে।

৬। **অর্থনৈতিক ও উপার্জনশীল কার্যক্রম ঃ** হাঁস-মুরগী পালন, শাক সবজির বাগান করা প্রভৃতির মাধ্যমে স্কাউটদের শ্রমের মর্যাদা ও স্বনির্ভরতা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হয়।

৭। **জনসংযোগ কার্যক্রম ঃ** স্কাউটকে জনপ্রিয় করার জন্য নিয়মিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রকাশনা প্রভৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৮। **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ** স্কাউটিং পরিচালনা এবং একে জোড়দার ও কার্যকর করার জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, স্কাউট প্রশিক্ষণ তৈরী করা এবং স্কাউটদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া।

পরিশেষে বলতে হয় স্কাউট আন্দোলন সুনাগরিক গড়ে তোলার একটি উপযুক্ত প্রক্রিয়া। স্কাউটিং এর মাধ্যমে একজন তরুন শুধু দেশপ্রেমিকই নয়, কর্মানুরাগী ও ধর্মানুরাগী হয়ে ওঠে।

সারাংশ

বৃটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯১০ সালে স্কাউট আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৮ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে 'পূর্ব পাকিস্তান স্কাউট সমিতি' গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এর নতুন নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি। ১৯৭৫ সালে কোপেনহেগেন এ অনুষ্ঠিত পঁচিশতম বিশ্ব স্কাউট সম্মেলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়। বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে বাংলাদেশ স্কাউট সমিতির নতুন নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ স্কাউটস।

স্কাউটিং হলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু, কিশোর, তরুন ও যুবকদেরকে সৎ, দক্ষ অনুগত ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার একটি প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর লক্ষ্য হলো শিশু, কিশোর তরুন ও যুবকদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন ও তাদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করা, তাদেরকে সৎ, দক্ষ দায়িত্বশীল ও কর্মঠ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, নৈতিক উৎকর্ষ সাধন ও মানবতাবোধ জাগ্রত করা ইত্যাদি।

স্কাউটস এর প্রতিজ্ঞা হলো সৃষ্টিকর্তা এবং দেশের প্রতি নিজ দায়িত্ব পালন করা, দুঃস্থ ও আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করা এবং স্কাউট আইন মেনে চলা।

বাংলাদেশ স্কাউটসকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে যেমনঃ (১) কাব স্কাউট, (২) বয়স্কাউট, (৩) রোভার স্কাউট

স্কাউট আইনগুলো হলো (ক) স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী; (খ) স্কাউট সকলের বন্ধু (গ) স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত; (ঘ) স্কাউট জীবের প্রতি সদয়; (ঙ) স্কাউট সদা প্রফুল্ল (চ) স্কাউট মিতব্যয়ী; এবং (ছ) স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাংগঠনিক কাঠামোর তিনটি স্তর রয়েছে। এগুলো হলোঃ (১) জাতীয় কাউন্সিল (২) আঞ্চলিক কাউন্সিল (৩) জেলা কাউন্সিল।

প্রতিটি স্তরের একটি কার্যনির্বাহি কমিটি আছে।

শিশু, কিশোর ও যুবকদের সার্বিক উন্নয়ন তথা চারিত্রিক উৎকর্ষ বিধানের জন্য আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং সমাজের কল্যাণে স্কাউটিং এর গুরুত্ব অপরিসীম।

দেশের বিশাল তরুণ ও যুবশক্তিকে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অবসর সময়ে কার্যকরভাবে ব্যবহারের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করেছে স্কাউটিং। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস নিম্মোক্ত বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে ১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটের শাখা স্থাপন, ২। পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন এবং দলীয় সহযোগীতা বৃদ্ধির জন্য বার্ষিক স্কাউট ক্যাম্পের আয়োজন করা, ৩। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য কর্মসূচী পরিচালনা করা, ৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অথবা অন্যান্য বিপর্যয়ের সময় ত্রাণ কর্মসূচী গ্রহণ, ৫। সেমিনার ও আলোচনা সভার মাধ্যমে স্কাউটদের লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা, ৬। স্কাউট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ৭। ছোট ছোট সমাজ উন্নয়ন মূলক অর্থনৈতিক ও উপার্জনশীল প্রকল্প গ্রহণ, ৮। হস্তশিল্প ও বিভিন্ন সৃষ্টিধর্মী কাজের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা, ৯। তাবু বাসের আয়োজন করে দলীয় জীবনে শৃঙ্খলা এবং বিভিন্ন কলাকৌশল প্রশিক্ষণ দান, ১০। জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্কাউটদের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা, ১১। উম্মুক্ত প্রাকৃতিক অঙ্গনে শিবিরবাসের আয়োজন করে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পাঠ অনুশীলনের মাধ্যমে মুক্তাঙ্গন জ্ঞান অর্জনে স্কাউটদের উৎসাহিত করা।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে হতাশাগ্রস্ত কর্মবিমুখ, শিশু, কিশোর ও যুব সমাজকে উপরিউক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সুন্দর আদর্শভিত্তিক গঠনমূলক জীবনের সন্ধান দিতে বাংলাদেশ স্কাউটস সদা সচেষ্ট।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ স্কাউটসের পটভূমি কী?
২. স্কাউটিং কী?
৩. স্কাউটিং এর লক্ষ্য কী?
৪. স্কাউটস এর স্তরগুলো কী?
৫. বাংলাদেশ স্কাউটস এর মূলমন্ত্র কী?
৬. বাংলাদেশ স্কাউটস এর আইন কী?
৭. বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাংগঠনিক কাঠামো কী?

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। _____সালে _____ উদ্যোগে ভারতীয় স্কাউট এসোসিয়েশন গঠিত হয়।
২। _____ সালে _____ অনুষ্ঠিত ----সম্মেলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ _____ ঘোষিত হয়।

পাঠ- ৬ ঃ বাংলাদেশ গার্লস গাইড সমিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ ৫-৬:১ বাংলাদেশ গার্লস গাইড সমিতি কী?
- ☞ ৫-৬:২ গার্লস গাইড সমিতির পটভূমি কী?
- ☞ ৫-৬:৩ গার্লস গাইড সমিতির মূলমন্ত্র কী?
- ☞ ৫-৬:৪ গার্লস গাইড সমিতির প্রতিজ্ঞা কী?
- ☞ ৫-৬:৫ গার্লস গাইড সমিতির আদর্শ ও নিয়মাবলী কী?
- ☞ ৫-৬:৬ গার্লস গাইড সমিতির বিভিন্ন শাখা কী?
- ☞ ৫-৬:৭ গার্লস গাইড সমিতির কার্যাবলী কী?

৫-৬:১ বাংলাদেশ গার্লস গাইড সমিতির পরিচয়

বিশ্বব্যাপী যে সংগঠন মেয়েদের আত্মসচেতন এবং মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ সৃষ্টি করেছে তা হল গার্লস গাইড আন্দোলন। মেয়েদের সৎ আত্মনির্ভরশীল ও সেবাপরায়ণ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আদর্শ সংগঠন হল গার্লস গাইড। এটি একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছামূলক আদর্শবাদী আন্দোলন। এটি ৬ থেকে ২৪ বছরের মেয়েদের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলার বিশেষ পদ্ধতি। গাইডিং আনন্দময় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেয়েদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে সৎ চরিত্রের অধিকারিণী, পারিবারিক জীবনে সুগৃহিণী ও দায়িত্বশীল মাতা এবং জাতীয় কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ সেবিকার আদর্শরূপে গড়ে তোলাই গাইডিং আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, দেশের প্রতি দায়িত্ব সচেতন এবং পরোপকারের মহান ব্রত নিয়ে কিশোরীরা যাতে মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতার দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে পারে সে অনন্য পন্থার নির্দেশনা দান গাইডিংয়ের লক্ষ্য।

জাতী, ধর্ম, বর্ণ রাষ্ট্র নির্বিশেষে গাইডিংয়ের আবেদন সর্বজনীন। এটি আদর্শবাদী, অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলন হিসেবে পৃথিবীর সবদেশে নন্দিত ও স্বীকৃত।

৫-৬:২ গার্লস গাইড সমিতির পটভূমি

স্যার রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল এর নেতৃত্বে বয়স্কাউট আন্দোলন যুবসমাজের ব্যাপক সাড়া জাগালে তা পর্যবেক্ষণ করে মেয়েদের মাঝেও অনুরূপ আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষাপটে ব্যাডেন পাওয়েল তার বোন এগনেস ব্যাডেন পাওয়েলের সহায়তায় গাইড আন্দোলনের সূচনা করে এবং ১৯১০ সালে প্রথম গাইড কোম্পানির রেজিষ্ট্রেশন হয়। ১৯১২ সালে ব্যাডেন পাওয়েল বিয়ে করার পর তার সুযোগ্য স্ত্রী লেডী ব্যাডেন পাওয়েল আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। স্বামীর প্রত্যক্ষ সহযোগীতা ও অনুপ্রেণায় প্রথমে ইংল্যান্ডে এরপর সারা বিশ্বে এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বিশ্বব্যাপী গাইড আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করার জন্য স্বামীর সাথে তিনি বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ান। ১৯৩০ সালে তিনি 'বিশ্ব গাইড' হিসেবে বিরল মর্যাদার স্বীকৃতি পান।

বাংলাদেশে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে। গার্লস গাইড আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়, প্রসিদ্ধ ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে লেডী ব্যাডেন পাওয়েল বিশ্ব সফর করেন। তার সফরের এক পর্যায়ে তিনি ১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে আগমন করেন। তার সফরের ফলশ্রুতি ও অনুপ্রেরণায় ১৯৬২ সালে পূর্ব "পাকিস্তান গার্লস গাইড সমিতি" গঠন করা হয়। স্বাধীনতার পর এর নতুন নামকরণ করা হয় "বাংলাদেশ গার্লস গাইড সমিতি" জন্মলগ্ন থেকে অর্থাৎ ১৯৬২ সাল থেকে এ সমিতি এদেশের শিশু, কিশোরী ও যুবতীদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, তথা সার্বিক বিকাশে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ গার্লস গাইড সমিতি সদস্যদের চরিত্র গঠনে একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত।

৫-৬:৩ গার্লস গাইড সমিতির মূলমন্ত্র

গাইডের মূলমন্ত্র বা (Motto) হচ্ছে প্রস্তুত থাকো। অর্থাৎ গাইডদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হয়। যাতে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে তারা সক্ষম হয়।

৫-৬:৪ গার্লস গাইড সমিতির প্রতিজ্ঞা

গাইডের প্রতিজ্ঞা হলো তিনটি। যেমনঃ

- স্রষ্টা ও দেশের প্রতি আমি আমার কর্তব্য পালন করব;
- সকল সময় পরের উপকার করব; এবং
- গাইডের নিয়মাবলী মেনে চলব।

৫-৬:৫ গার্লস গাইড সমিতির আদর্শ ও নিয়মাবলী

গাইডদের আচার আচরণের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ১০টি নিয়ম বা আদর্শ রয়েছে। যেমনঃ

(ক) গাইড এর আত্মমর্যাদা নির্ভরযোগ্য;
(খ) গাইড কর্তব্যপরায়ণ;
(গ) গাইড এর কর্তব্য অন্যকে সাহায্য করে;
(ঘ) গাইড সকলের বন্ধু এবং গাইড মাত্রই গাইডের ভগ্নি;
(ঙ) গাইড মাত্রই বিনয়ী;
(চ) গাইড জীবনের বন্ধু;
(ছ) গাইড বিনাবাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করে;
(জ) গাইড বিপদে হাসে ও গান করে;
(ঝ) গাইড মিতব্যয়ী
(ঞ) কথা কাজ ও চিন্তায় গাইড সর্বদাই নির্মল।

৫-৬:৬ গার্লস গাইড সমিতির বিভিন্ন শাখাসমূহ

মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের ওপর লক্ষ্য রেখে গার্ল গাইড সদস্যাদের নিম্নোক্ত শাখায় ভাগ করা হয়; যেমনঃ

১। **হলদে পাখি গাইড ঃ** ছয় থেকে দশ বছরের মেয়েদের নিয়ে এ শাখা গঠিত। দলীয় খেলাধুলার মাধ্যমে এ শ্রেণীর মেয়েদের নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়। এদের কাজ হচ্ছে "বড়দের কথা শোনা এবং নিজের মত না চলা"। তাদের প্রতিজ্ঞা হচ্ছেঃ

(ক) স্রষ্টা ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করা।
(খ) প্রত্যহ ঘরের কাজে সাহায্য করা ঃ একটা হলদে পাখি ঝাঁকে সর্বোচ্চ ২৪ জন মেয়ে থাকে। এদের ছয় জনের একটি দলকে ষষ্ঠক বলা হয়। তাদের জন্য দুজন গাইডার থাকেন। একজন 'বিজ্ঞ পাখি' অপর জনকে 'ছোট বিজ্ঞপাখি' বলা হয়। হলদে পাখিকে সাহায্য করা এদের মূল কাজ।

২। **গার্ল গাইড ঃ** ১০ থেকে ১৬ বছরের মেয়েরা এর সদস্যা। এদরকে বিশেষত বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। একটি গাইড কোম্পানিতে ৩৫ জন মেয়ে থাকে। এদের ৯ জনের এক দলকে বলা হয় 'সদা প্রস্তুত থাকো'।

৩। **রেঞ্জার গাইড ঃ** ১৬ থেকে ২৪ বছরের মেয়েরা এ শাখাভুক্ত। আদর্শ নাগরিকের গুণাবলী অর্জন করে দেশ ও জাতীর সেবা করা এদের মূল লক্ষ্য। একটি রেঞ্জার ইউনিটে ৫ জন থেকে ১৫ জন মেয়ে থাকে।

৪। **ক্যাডেট রেঞ্জার ঃ** টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীগণ বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ক্যাডেট রেঞ্জার মর্যাদা লাভ করেন। বর্তমানে শারীরিক শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য এ কোর্সটি চালু রয়েছে।

৫। **গাইডার ঃ** ১৮ বছর ও তার উর্দ্ধ বয়সের একজন শিক্ষিত মহিলা যখন প্রশিক্ষণ নিয়ে তা বাস্তবে কাজে লাগান যেমন ঝাঁক কোম্পানি, ইউনিট পরিচালনা করেন তখন তাকে গাইডার বলা হয়।

৬। **গাইড সম্প্রসারণ ঃ** অন্ধ, মুক ও বধির যারা সাধারণ হলদে পাখির ঝাঁক এবং কোম্পানিসমূহে যোগ দিতে অসমর্থ তাদের নিয়ে বিশেষভাবে ঝাঁক ও কোম্পানি গঠন করা হয়। এ শাখাটিকে এক্সটেনশন গাইডিংও বলা হয়।

৫-৬:৭ গার্লস গাইড সমিতির কার্যাবলী

গাইডসদের মূল আদর্শ হলো তিনটি। যেমনঃ

(ক) স্রষ্টা ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করা;
(খ) পরোপকার করা এবং

(গ) গাইডের নিয়মাবলী মেনে চলা।

এই তিনটি আদর্শের আওতায় বাংলাদেশ গাইডসের সকল কার্যক্রম চারটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভসমূহ হচ্ছেঃ

১. চরিত্র ও প্রতিভার উন্মেষ;
২. স্বাস্থ্যের অনুশীলন;
৩. সৃজন শক্তি ও হস্তশিল্পের বিকাশ; এবং
৪. সমাজসেবা।

উল্লেখিত আদর্শ ও স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ গাইডস যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তার প্রধান প্রধানগুলো নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর শাখা সম্প্রসারণ করা।
২. উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গাইডসদের পরিবার, সমাজ, জাতী ও বিশ্বে সেবাদানের উদ্দেশ্যে দৈহিক ও মানসিকভাবে গড়ে তোলা।
৩. বিভিন্ন বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি যেমন বন্যা ,ঝড়, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান করা।
৪. শিশুদের সেবা ও যত্নের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
৫. দেশের বিভিন্ন এলাকায় মহিলাদের জন্য 'সেলাই শিক্ষা', 'হস্তশিল্প' প্রভৃতি ধরণের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে মহিলাদের কল্যাণ ও উন্নয়নে সহায়তা করা।
৬. অজ্ঞতা নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সামাজিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী পরিচালনা করা।
৭. উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৮. সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বুকলেট, পুস্তিকা, জাতীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে গাইডসের আদর্শ ও নীতিমালাকে জনপ্রিয় ও বিস্তৃত করা।
৯. জাতীয় পর্যায়ে ক্যাম্পের আয়োজন করে সদস্যদের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির মাধ্যমে কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপন করা।

উপযুক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ গাইডস, শিশু, কিশোরী ও যুবতীদের সামগ্রিক বিকাশ সহ সমাজ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা সতের হাজারেরও অধিক। প্রশাসনিক জটিলতাসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা না থাকলে বাংলাদেশ গাইডস সমাজ ও মহিলাদের কল্যাণে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রাখতে সক্ষম।

সারাংশ

ছেলেদের স্কাউট আন্দোলনের মত গার্লস গাইড আন্দোলন একটি স্বেচ্ছামূলক অরাজনৈতিক মহিলা যুব আন্দোলন। যুবক যুবতীদের মধ্যে স্কাউট সম্পর্কে সাড়া জাগাতে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্যার রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল কর্তৃক রচিত *scouting for boys* স্বয়ংসম্পূর্ণ ভুমিকা পালন করে। এরই ফলশ্রুতিতে তারই বোন এগনেস ব্যাডেন পাওয়েলের সহাযোগীতায় রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল ১৯১০ সালে গাইড আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯১২ সালে ব্যাডেন পাওয়েলের স্ত্রী লেডী ব্যাডেন পাওয়েলের নেতৃত্বে গতিশীলতা অর্জন করে। লেডী ব্যাডেন পাওয়েল গার্লস গাইড আন্দোলনকে সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্য হিসেবে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬২ সালে গার্লস গাইড সমিতি' গঠন করেন। স্বাধীনতার পর এই সমিতির নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ গার্লস গাইড সমিতি'।

গার্লস গাইড হলো বিশ্বের মেয়েদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ইত্যাদি দিকের উৎকর্ষ সাধনের একটি বাস্তবধর্মী প্রক্রিয়া। গাইডসের মূলমন্ত্র হচ্ছে সদা প্রস্তুত থাকা। গাইডের প্রতিজ্ঞার মধ্যে আছে স্রষ্টা ও দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন; অন্যের উপকার করা ও গাইডসের নিয়মাবলী অনুসরণ করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ বাংলাদেশ গার্লস গাইড সমিতি কী?
২ গার্লস গাইড সমিতির পটভূমি লিখুন।
৩ গার্লস গাইড সমিতির নিয়মাবলী কী?
৪ গার্লস গাইড সমিতির বিভিন্ন শাখা কী?

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গার্লস গাইড সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন
ক) রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল খ) ফ্লরেন্স নাইটিংগেল
গ) লেডী ব্যাডেন পাওয়েল ঘ) মার্গারেট স্যাঙ্কার।

২. গার্লস গাইড এর প্রতিজ্ঞা হলো
ক) সবসময় প্রস্তুত থাকা খ) প্রতিজ্ঞা করা
গ) উদ্যোগী হওয়া ঘ) সেবা করা

পাঠ- ৭ ঃ গ্রামীণ ব্যাংক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ৫-৭:১ গ্রামীণ ব্যাংকের পটভূমি তুলে ধরতে পারবেন।
- ৫-৭:২ গ্রামীণ ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ৫-৭:৩ গ্রামীণ ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- ৫-৭:৪ গ্রামীণ ব্যাংকের লক্ষ্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- ৫-৭:৫ গ্রামীণ ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো বলতে পারবেন।
- ৫-৭:৬ গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ প্রদানের খাত সমূহ বলতে পারবেন।
- ৫-৭:৭ গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- ৫-৭:৮ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা ও গুরুত্ব দেখাতে পারবেন।

৫-৭:১ গ্রামীণ ব্যাংকের পটভূমি

গ্রামীণ ব্যাংক সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন ধারণা যার উদ্যোক্তা ২০০৬ সালের শান্তিতে নোবেল বিজয়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ড. মুহম্মদ ইউনুস। তিনি ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে গ্রামের দুঃস্থ ও অসহায় শ্রেণীর (পুরুষ ও মহিলা) শ্রম কিভাবে শোষণ করা হয় তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। অর্থনীতিবিদ হিসেবে তিনি আরো বুঝতে পারেন যে এই শ্রেণী শুধুমাত্র পুঁজির অভাবে মহাজন ও ভূ-স্বামীদের শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অথচ তাদের যদি নিজস্ব মূলধন থাকত তবে তারা বর্তমানের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে অনেক ভালভাবে জীবন কাটাতে সক্ষম হত।

তার এই উপলব্ধিবোধ থেকেই মূলত গ্রামীণ ব্যাংক ধারণাটির উৎপত্তি। কারণ এই ধারাবাহিকতায় গ্রামের দুঃস্থ ও অসহায় শ্রেণীর (পুরুষ ও মহিলা) শ্রমের মূল্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদেরকে সীমিত মূলধন সরবরাহ করার নিমিত্তে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে জোবরা গ্রামে একটি 'পরীক্ষামূলক প্রকল্প' চালু করা হয়। প্রকল্পটির নামকরণ করা হয় গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প। প্রাথমিক অবস্থায় প্রকল্পটি জনতা ব্যাংকের সহায়তায় ভূমিহীনদের মাঝে ঋন প্রদান শুরু করে এবং এর অপারেশনাল দায়িত্ব অর্পিত হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লী অর্থনীতি কর্মসূচীর উপর। প্রাথমিক ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় ড. মুহম্মদ ইউনুসের অনুরোধে জোবরা গ্রামে একটি 'পরীক্ষামূলক গ্রামীণ ব্যাংক শাখা' চালু করে। প্রকল্পটির কার্যকারীতা লক্ষ্য করে সোনালী ব্যাংক সহায়তা দানে আগ্রহী হয়। ফলে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে পাশ্ববর্তী গ্রামে প্রকল্পটি বিস্তার লাভ করে।

চট্রগ্রামে ৩ বছর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৯৭৯ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিক ভাবে টাঙ্গাইল জেলায় উদ্বোধন করা হয়। ১৯৮০ সালের মে মাস নাগাদ টাঙ্গাইল ও চট্টগ্রামে ২৪টি পরীক্ষামূলক গ্রামীণ ব্যাংক শাখা খোলা হয়।

১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD) প্রকল্পটিকে সহায়তা দানে এগিয়ে আসায় এটাকে ঢাকা, রংপুর এবং পটুয়াখালি জেলায় সম্প্রসারিত করা হয়। তাছাড়া ইউনিসেফ এবং (UNICEF) ফোর্ড ফাউণ্ডেশন (Ford Foundation) অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৮৩' জারির মাধ্যমে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ প্রকল্পটি গ্রামীণ ব্যাংক নামে স্বায়ত্বশাসিত একটি বিশেষ অর্থলগ্নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

৫-৭:২ গ্রামীণ ব্যাংকের সংজ্ঞা

গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে পল্লীর ভূমিহীন দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের ঋনদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নকারী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য হলো বিনা জামানতে গরীবের কাছে ব্যাংকের ঋন সুবিধা এনে দেয়া, যাতে তারা মহাজনের অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করে নিজেদের আয়ের পথ নিজেরাই বের করে নিতে পারেন, নিজেদেরকে একটি সংগঠনের আওতায় আনতে পারেন এবং নিজেদের মধ্যে একটা সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়তে পারেন। গ্রামীণ দরিদ্র এবং বিত্তহীনদের, যাদের আনুষ্ঠানিক ঋন পাবার সুযোগ নেই, তাদেরকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত।

৫-৭:৩ গ্রামীণ ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

গ্রামীণ ব্যাংক এমন একটি ব্যবস্থা, যা সনাতন ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গ্রামীণ ব্যাংকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১। গ্রামীণ ব্যাংক শুধু ভূমিহীনদের সাথে ব্যাংকিং ব্যবসা করে।
২। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের জন্য কোন জামানত লাগেনা।
৩। সব ধরনের আয় সৃষ্টিকারী কাজের জন্য ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে।
৪। ঋণ গ্রহীতারা ব্যাংকের কাছে আসেনা, ব্যাংক কর্মচারী ঋনগ্রহীতার নিকট গিয়ে থাকে।
৫। এতে নগদ ঋণের চেয়ে সম্পদ সৃষ্টিকারী দ্রব্যঋনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।
৬। ব্যাংকের ঋণ পেতে হলে কমপক্ষে পাঁচজনে দল করতে হয়।
৭। ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতা ছাড়া দলের সব সদস্যকে যৌথভাবে কাজ করতে হয়।
৮। ঋণগ্রহীতাগণ কেবল ব্যাংকের মক্কেলই নন তারা ব্যাংকের মালিক এবং ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।
৯। গ্রামীণ ব্যাংকের ৩ জন মহিলা কর্মী থাকা অপরিহার্য।
১০। কর্মীরা ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা সদস্য।
১১। ব্যাংকের কর্মচারীদের অবশ্যই গ্রামে থাকতে হবে।
১২। ব্যাংকের সদস্য হওয়ার জন্য লেখাপড়া জানতে হবে এমন কোন শর্ত নেই।
১৩। গ্রামীণ ব্যাংকের একটি দলীয় তহবিল রয়েছে। সদস্যগণ ঋণ নেবার সময় ঋণের পাঁচ শতাংশ দলীয় কর হিসেবে কেটে দলীয় তহবিলে জমা রাখা হয়। দলীয় কল্যাণে এ তহবিল ব্যবহার করা হয়।
১৪। জরুরী বা আপদকালীন তহবিল নামে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি তহবিল রয়েছে। সাধারণত দুর্ঘটনা বীমা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে এ তহবিলের উদ্ভব।

৫-৭:৪ গ্রামীণ ব্যাংকের লক্ষ্য

গ্রামীণ ব্যাংকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য থেকে এর উদ্যেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় তা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১। দরিদ্র ও ভূমিহীনদের যে কোন আয় উপার্জনকারী কর্মকাণ্ডের জন্য সহজ শর্তে ঋনদান করা।
২। বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা।
৩। ভূস্বামী ও মহাজনদের নির্যাতন ও শোষণের হাত থেকে দরিদ্র সম্প্রদায়কে রক্ষা করা।
৪। দরিদ্র শ্রেণীর শ্রমের মূল্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।
৫। দরিদ্র শ্রেণীর জীবন মানের উন্নয়ন সহ তাদের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা।
৬। ঋণগ্রহীতাদের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা।
৭। গ্রামীণ জনগণের মাঝে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগীতামূলক মনোভাব গড়ে তোলার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি অর্জনে সহায়তা করা।

৫-৭:৫ গ্রামীণ ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো

গ্রামীণ ব্যাংকের নীতি ও কার্যপ্রণালী ব্যাংকের পরিচালক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সর্বমোট ১৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড গঠিত হয়।

উপরিউক্ত সদস্যদের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকে একজন চেয়ারম্যান কর্মরত থাকেন যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। ব্যাংক পরিচালনার সুবিধার্থে চেয়ারম্যান নিয়োগের পাশাপাশি আরো ৭ জন সদস্য সরকার নিয়োগ দান করে থাকেন। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋন গ্রহীতাদের মধ্যে থেকে ৪ জন সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালনা বোর্ডের সদস্যরূপে মনোনয়ন লাভ করেন। এই ৪ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা। গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকও পরিচালনা বোর্ডের একজন সদস্য। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ ইউনুস বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৫-৭:৬ গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ প্রদানের খাত সমূহ

বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে যে সকল খাতে পুরুষ ও মহিলাদের ঋণ প্রদান করা হয় সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১। **উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ঃ** এ খাতের আওতায় আসে বাঁশ ও বেতের কাজ, ছাতা মেরামত, মিষ্টি তৈরী প্রভৃতি।

২। **কৃষি ও বন ঃ** এর আওতায় আসে বৃক্ষ রোপন, ইক্ষু চাষ, শাকসব্জির চাষ, ফলমূলের চাষ প্রভৃতি।

৩। **পশুপালন ও মৎস চাষ ঃ** গরু, বাছুর, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী, প্রভৃতি পালন, মৎস চাষ, মাছ ধরার নৌকা, জাল প্রভৃতি।

৪। **সার্ভিসেস ঃ** নির্মাণ কাজ, সেলুন রিক্সা, ডেকোরেটর প্রভৃতি।

৫। **ফেরী ব্যবসায় ঃ** বাঁশের ঝুড়ি, কাপড়, সাবান, তৈলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ফেরী ব্যবসায়।

৬। **দোকানদারী ঃ** মুদিদোকান, চা-দোকান, পান-দোকান প্রভৃতি।

৭। **ব্যবসায় ঃ** এর আওতায় আসে ধান, চাল, কাঠ, গুড়, দোকান, মৌসুমী শস্য প্রভৃতি।

৮। **যৌথ কার্যক্রম ঃ** যৌথভাবে পরিচালনযোগ্য কার্যক্রম যেমন বাজার নিলাম, ধান কল ক্রয়, খামার, মৎস চাষ প্রভৃতি।

৯। **গৃহনির্মাণ ঋণ ঃ** গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৭ সালে 'গৃহ নির্মাণ প্রকল্প' নামে একটি নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। গ্রামীণ দুঃস্থ ও বিত্তহীনদের গৃহ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ডিসেম্বর'৯৮ পর্যন্ত গৃহনির্মাণ খাতে ঋণ বিতরনের পরিমান ৭২১ কোটি টাকা।

১০। **বিবিধ ঃ** এর আওতায় আসে ঢেঁকিতে ধান বানা, ডাল ভাঙা, তাঁত জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়, গরু-মহিষের গাড়ি চালানো প্রভৃতি।

৫-৭:৭ গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যাবলী

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নের সাধনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম সমূহ হচ্ছেঃ

১। **ঋণদান কর্মসূচী ঃ** গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এই কর্মসূচীর অধীনে গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন জনসাধারণকে সহজ শর্তে ঋণদান করা হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কৃষিকাজ, মৎসচাষ, পশুপালন, হাঁস-মুরগী পালন, ব্যবসা- বাণিজ্য, যানবাহন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণদান করে থাকে।

২। **জয় সাগর মৎস প্রকল্প ঃ** পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় পাঁচটি থানায় জয় সাগর মৎস প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়।

৩। **গৃহনির্মাণ কর্মসূচী ঃ** গ্রামীণ ব্যাংকের গৃহহীন সদস্যদের গৃহনির্মাণে সহায়তা করার জন্য ১৯৮৪ সালে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৭ সালের বন্যার ফলে এই কর্মসূচীর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

৪। **পোনা উৎপাদন কেন্দ্র ঃ** গ্রামীণ ব্যাংকের অন্যতম সাফল্যজনক কর্মসূচী হচ্ছে পোনা উৎপাদন কেন্দ্র। এই কর্মসূচীর অধীনে প্রায় ৬ কোটি ৬০ লাখের মত পোনা উৎপাদন করে ১৯৮৬ সালে দেশের সবগুলো পোনা উৎপাদনকারী হ্যাচারীর মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ পোনা উৎপাদনের সুনাম অর্জিত হয়।

৫। **চকোরিয়া চিংড়ি খামার ঃ** গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মসূচীর আওতায় চকোরিয়ায় তিনশ একর জমিতে চিংড়ি চাষ করার জন্য চিংড়ি খামার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৬। **অগভীর নলকূপ স্থাপন ঃ** কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য যৌথ উদ্যোগে অগভীর নলকূপ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

৭। **ধানকল স্থাপন ঃ** অর্থনৈতিক উপার্জনে অক্ষম দরিদ্র মহিলাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা দানের লক্ষ্যে মহিলাদের যৌথ উদ্যোগে ধানকল স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় গ্রামীণ ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদেরকে ঋণ প্রদানের সাথে সাথে তাদের সামাজিক ও সাংগঠনিক উন্নয়নের দিকেও সমান গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। গ্রামীণ দরিদ্র, অবহেলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত, অত্যাচারিত, ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক আশার আলোকবর্তিকা হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

৫-৭:৮ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা ও গুরুত্ব

বাংলাদেশ বিশ্বের দারিদ্র দেশগুলোর অন্যতম। এ দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১২.৮১ কোটি যাদের শতকরা ৮০ জন গ্রামে বাস করে। মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে যাদের বার্ষিক মাথাপিছু আয় মাত্র ৮ ৫০ মার্কিন ডলার বা তারও কম। মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ০.২৫ একর। বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় ৮ ২৭৩ মার্কিন ডলার। গ্রাম এলাকার অধিকাংশ জনগণ অপূরিত মৌল মানবিক চাহিদা এবং বেকারত্ব ও মৌসুমী বেকারত্বের শিকার। তাছাড়া দারিদ্র, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, মাথাপিছু নিম্ন আয়, পুঁজির অভাব, গ্রাম্য মহাজন ও টাউটদের নির্যাতন ও শোষনসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। গ্রামীণ জনগণের এ সকল সমস্যা মোকাবেলা করে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধনে গ্রামীণ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

প্রথমত, জাতীয় উন্নয়ন অগ্রগতির প্রধান শর্ত হলো সংগঠিত জনশক্তি। গ্রামীণ ব্যাংক তার ঋনদান প্রক্রিয়ায় দল এবং কেন্দ্র গঠন বাধ্যতামূলক করায় দরিদ্র জনগণ সংগঠিত হয়ে বিভিন্ন আয় উপার্জনকারী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে।

দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ নিজস্ব পুঁজির অভাবে বাধ্য হয়ে গ্রাম্য মহাজন ও টাউটদের দ্বারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত ও শোষিত হচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংক বিনা জামানতে ঋনদানের মাধ্যমে পুঁজি সরবরাহ করে মহাজন ও টাউটদের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করছে।

তৃতীয়ত, গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র জনগণের মধ্যে পুঁজি সংগ্রহ করে হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পুনরুজ্জীবিত করে জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

চতুর্থত, বাংলাদেশে বর্তমানে বেকারত্ব বিরাট আকার ধারণ করেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রত্যক্ষ সহায়তায় দরিদ্র জনগণ বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ায় বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

পঞ্চমত, গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং গ্রামীণ এলাকায় অ-কৃষি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ফলে গ্রামীণ জনগণের শহরমুখী প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পাচ্ছে।

ষষ্ঠত, বাংলাদেশের জনগণের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৮ ২৭৩ মার্কিন ডলার। ধনিক শ্রেণীর আয় বাদ দিলে অধিকাংশ জনগণের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৮ ৫০ মার্কিন ডলারের অধিক হবেনা। গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র জনগণকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে তাদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে জাতীয়ভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

সপ্তমত, গ্রাম এলাকার উন্নয়নে স্থানীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদান প্রক্রিয়ায় দল ও কেন্দ্র এবং তাদের নেতা নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অষ্টমত, গ্রাম এলাকায় অপরাধপ্রবণতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অপূরিত মৌল মানবিক চাহিদা এবং বেকারত্ব। গ্রামীণ ব্যাংক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস এবং দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি করে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করছে। ফলে গ্রাম এলাকায় অপরাধপ্রবণতাও হ্রাস পাচ্ছে।

নবমত, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হচ্ছে নারী। মহিলারা এতদিন শুধু গৃহকর্মেই আবদ্ধ থাকত। গ্রামীণ ব্যাংকের সহায়তায় গ্রামের দরিদ্র ও ভূমিহীন মহিলারা বিভিন্ন ধরনের আয় উপার্জনকারী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতিতে অবদান রাখছে।

দশমত, গ্রামীণ ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য বি.আই.ডি.এস (BIDS) এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD) এক বস্তুনিষ্ঠ সমীক্ষা পরিচালনা করে।

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে গ্রামীণ দরিদ্র ও ভূমিহীনদের জীবনমানের উন্নয়নসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক যে অবদান রেখে চলেছে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তার ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

সারাংশ

গ্রামের ভূমিহীন গরিব পুরুষ ও মহিলাদের ঋন প্রদানের একটি বিশেষ আর্থিক প্রক্রিয়া হল গ্রামীণ ব্যাংক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনুস ১৯৭৬ সালে ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী জোবরা গ্রামে একটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে এর যাত্রা চালু করেন। বর্তমানে দেশব্যাপী এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যাংকের বিশেষত্ব হচ্ছে নিজস্ব সংগঠনের আওতায় সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা, বিনা ঝামেলাতে ঋন সুবিধা দান, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রাম্য মহাজন ও সুদখোরদের হাত থেকে ভূমিহীনদেরকে রক্ষা করাই এর মূল লক্ষ্য। এই ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো জামানত ছাড়া শুধু ভূমিহীনদের মধ্যে ঋনদান করা।

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋন প্রদানের খাত সমূহের মধ্যে আছে- প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদনশীল খাত, যৌথ কার্যক্রম খাত, কৃষি, পশু, ব্যবসা, মৎস ও সেবামূলক খাত ইত্যাদি। গ্রামীণ ব্যাংকের ১৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি পরিচালনা বোর্ড আছে। এতে সরকার নিয়োজিত একজন চেয়ারম্যান, ৭ জন সদস্য থাকেন। ঋনগ্রহীতাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত ২ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা আছেন। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ ইউনুস বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গ্রামীণ ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে আছে - ঋনদান কর্মসূচী, জয় সাগর মৎস প্রকল্প, গৃহনির্মাণ কর্মসূচী, পোনা উৎপাদন কেন্দ্র, চকোরিয়া চিংড়ি খামার, অগভীর নলকূপ স্থাপন, ধানকল স্থাপন ইত্যাদি।

গ্রামীণ ব্যাংকের অবদান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভূমিহীনদের মাঝে ঋনদান, আয় উৎপাদন ও সঞ্চয় বৃদ্ধি, স্বাবলম্বন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, মজুরী বৃদ্ধি, সুদের হার হ্রাস, যৌতুক বিহীন বিবাহ, বিশুদ্ধ পানি, সামাজিক কাজ, বেকারত্ব দূরীকরণ, নারী পুরুষের আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গ্রামীণ ব্যাংকের পটভূমি লিখুন।
২. গ্রামীণ ব্যাংক কী?
৩. গ্রামীণ ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য কী?
৪. গ্রামীণ ব্যাংকের লক্ষ্য কী?
৫. গ্রামীণ ব্যাংকের ঋন প্রদানের খাত সমূহ কী?

সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন ফজলে হাসান আবেদ মিয়া।
২। গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১৩ জন।

পাঠ- ৮ ঃ ব্র্যাক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ৫-৮:১ ব্র্যাকের পটভূমি কী?
- ৫-৮:২ ব্র্যাক কী?
- ৫-৮:৩ ব্র্যাকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?
- ৫-৮:৪ ব্র্যাকের কার্যক্রম কী?

৫-৮:১ ব্র্যাকের পটভূমি

বাংলাদেশে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জনাব ফজলে হাসান আবেদ যিনি পেশায় একজন চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট। ১৯৭০ এর প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। কর্মরত বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ত্রাণ তৎপরতা পর্যবেক্ষণ এবং ত্রাণ কর্মীদের সাথে মত বিনিময়ে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাই জনকল্যাণমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করে।

পরবর্তিতে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের দুঃখ দুর্দশা পর্যবেক্ষণ করে তাদের মাঝে ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর প্রেক্ষাপটে SAVE BANGLADESH 'বাংলাদেশ বাঁচাও' নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করেন এবং অর্থ ও সাহায্য সংগ্রহের মাধ্যমে শরণার্থীদের মাঝে ত্রাণ তৎপরতা শুরু করেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালে ত্রাণ তৎপরতার মাধ্যমে অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং উদ্বৃত অর্থের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ শরণার্থীদের পুনর্বাসন করার জন্য ১৯৭২ সালে সিলেট জেলার 'শাল্লা' গ্রামে 'বাংলাদেশ পুনর্বাসন সহায়তা কমিটি' (Bangladesh Rehabitation Assistance Commitee) নামে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন।

নতুন সংগঠনের মাধ্যমে পুনর্বাসন সহায়তা দিতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে তার এই কর্মসূচী সাহায্য গ্রহীতা দের মাঝে নির্ভরশীলতা (dependency) সৃষ্টি করেছে। নতুন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে তিনি 'কর্মসূচীর প্রকৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন' সাধনের সিদ্ধান্ত নেন।

নতুন সিদ্ধান্তের আলোকে তিনি জনগণের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল (ঝবষভ জবষরবহঃ) হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালের পূর্বের (Bangladesh Rehabitation Assistance Commitee) এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করেন Bangladesh Rural Advancement Commitee - BRAC বাংলায় যা 'বাংলাদেশ পল্লী প্রগতি পরিষদ' তথা সংক্ষেপে ' ব্র্যাক' নামে পরিচিত।

৫-৮:২ ব্র্যাকের সংজ্ঞা

বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত বেসরকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে ব্র্যাক অন্যতম। গ্রামীণ দরিদ্র ও অসহায় জনগণের কল্যাণ ও স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ব্র্যাক হচ্ছে সর্ববৃহৎ বেসরকারী সেবা ও কল্যাণমূলক সংস্থা।

৫-৮:৩ ব্র্যাকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দুঃস্থ, অসহায় তথা তৃণমূল জনগণের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েই ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যে সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে তা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১। তৃণমূল জনগণ তথা জনগণকে (Target population) সংগঠিত করা।

২। জনগণের সমস্যা, সম্পদ, সামর্থ, সম্ভাবনা, প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৩। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার দূরীকরণের লক্ষ্যে জনগণকে স্বাক্ষর হিসেবে গড়ে তোলা।

৪। মানুষ হিসেবে সমাজে জনগণের ভূমিকা, দায়িত্ব, অধিকার সম্পর্কে 'রাজনৈতিক সচেতনতা' সৃষ্টি করা।

৫। বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণকে দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

৬। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের জন্য কর্ম সংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭। স্বাস্থ্যবিধি প্রচার ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৮। স্থানীয় কর্মসূচী স্থানীয়ভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করা।

৯। কর্মসূচীর দুর্বলতা ও দোষত্রুটি চিহ্নিত করে একে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

১০। সবার উপর গ্রামীণ বিত্তশালী ও মহাজনদের শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য জনগণকে সম্পূর্ণরূপে স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলা।

৫-৮:৪ ব্র্যাকের কার্যক্রম

এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ব্র্যাক কর্তৃক যেসব কর্মসূচী পরিচালিত হয়ে থাকে সেগুলো নিম্নরূপঃ

১) **গ্রামীণ ঋণদান কর্মসূচী ঃ** এই কর্মসূচীর আওতায় গ্রামীণ দরিদ্র জনসমষ্টিকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণদান করা হয়। এই কর্মসূচী মূলত দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয় সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে সংগঠিত করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থ উপার্জনে সক্ষম করে তোলাই হচ্ছে এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।

২) **আইনভিত্তিক সেবামূলক কর্মসূচী ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অজ্ঞ। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতাজনিত কারণে তারা দেশে প্রচলিত সামাজিক ও নিরাপত্তামূলক আইনসমূহের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে যেমন অজ্ঞ তেমনিভাবে তাদের অধিকার সম্পর্কেও অজ্ঞ। তাই এই দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের অবিচার, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য আইনগত সহায়তা দানের লক্ষ্যে ব্র্যাক এই কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে। দেশের নিরক্ষর অজ্ঞ জনগোষ্ঠীকে প্রচলিত আইন সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই হচ্ছে এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।

৩) **সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ** গ্রামের দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগীতামূলক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে ব্র্যাক সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনা করছে। ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনই হচ্ছে এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।

৪) **ব্র্যাক ব্যাংক প্রকল্প ঃ** প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রাদনের জন্য ব্র্যাক ব্যাংক প্রকল্প কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে।

৫) **স্বাস্থ্য কর্মসূচী ঃ** ব্র্যাক তার সূচনালগ্ন থেকেই স্বাস্থ্য কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশেষ করে দেশের অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থায় মা ও শিশুর জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্র্যাক এর স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী রয়েছে। যে দুটি কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্র্যাক তার স্বাস্থ্য কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে তা হচ্ছেঃ

(i) খাবার স্যালাইন শিক্ষা কর্মসূচী ঃ এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ডায়রিয়া প্রতিরোধকল্পে খাবার স্যালাইন ব্যবহার শিক্ষা দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ব্র্যাক কর্মীদের সমগ্র দেশে মহিলাদেরকে খাবার স্যালাইন তৈরী প্রক্রিয়া শেখানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের গণসংযোগ মাধ্যম যেমন রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়।

(ii) মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম ঃ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষাদান, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মা চিহ্নিতকরণ, প্রসবপূর্ব ও প্রসব পরবর্তি পরিচর্যা, টিকাদান, পুষ্টি সম্পর্কিত শিক্ষাদান, নিরাপদ প্রসব ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে ব্র্যাক মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৬) **পল্লী উদ্যোগ প্রকল্প ঃ** গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী, কার্যকর ও গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ব্র্যাক কর্তৃক পল্লী উদ্যোগ প্রকল্প কর্মসূচী পরিচালিত হয়ে থাকে।

৭) **আড়ং ঃ** ব্র্যাকের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আড়ং। কুটির শিল্পের বিকাশ সাধনের পাশাপাশি হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ঢাকাসহ সারাদেশে মোট পাঁচটি বিক্রয়কেন্দ্র ও একটি রপ্তানিকেন্দ্রের মাধ্যমে ব্র্যাক এই কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে।

৮) **শিক্ষামূলক কর্মসূচী ঃ** ব্র্যাক তার সূচনাকালীন সময় থেকেই শিক্ষামূলক কর্মসূচীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী এবং মানব সম্পদের উন্নয়নসাধনের লক্ষ্যে ব্যবহারিক শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্র্যাক তার শিক্ষামূলক কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে।

৯) **পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ** গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে দলীয় ভিত্তিতে ঋণদানের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ব্র্যাক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে। সমবায় প্রচেষ্টায় গ্রামীণ অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করাই হচ্ছে এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।

১০) **হাওর উন্নয়ন প্রকল্প ঃ** সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ এলাকা হাওর এলাকা নামে পরিচিত। এই এলাকার জনগনের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনকল্পে ব্র্যাক হাওর উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচী পরিচালনা করছে।

১১) **মানিকগঞ্জ প্রকল্প ঃ** সামাজিক শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মানিকগঞ্জ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে ব্র্যাকের এই কর্মসূচী পরিচালিত হয়ে থাকে।

১২) **জামালপুর প্রকল্প ঃ** জামালপুর কেবল দরিদ্র নারীদের সহায়তাদানের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে ব্র্যাকের জামালপুর প্রকল্প কর্মসূচী পরিচালিত হয়ে থাকে।

১৩) **গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ঃ** ব্রাক কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা ও যথার্থতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে ব্র্যাকের নিজস্ব গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ কাজ করে থাকে।

সারাংশ

বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত বেসরকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে ব্র্যাক অন্যতম। গ্রামীণ দরিদ্র ও অসহায় জনগণের কল্যাণ ও স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ব্রাক হচ্ছে সর্ববৃহৎ বেসরকারী সেবা ও কল্যাণমূলক সংস্থা। ১৯৭২ সালে সিলেটের 'শাল্লা' গ্রামে প্রথম এর কার্যক্রম শুরু হয়। জনাব ফজলে হাসান আবেদ হলেন ব্র্যাকের প্রধান উদ্যোক্তা। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত 'শাল্লা' গ্রামের জনগণের গৃহ নির্মাণ এবং পুনর্বাসনের জন্য 'বাংলাদেশ পুনর্বাসন কমিটি নামে একটি সংস্থা গঠন করে ব্র্যাকের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। পরবর্তিতে গ্রামের দরিদ্র লোকদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালে এ কমিটির নতুন নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ পল্লী প্রগতি পরিষদ' (Bangladesh Rural Advancement Commitee –BRAC)।

গ্রামের দরিদ্র মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া জনগণকে সংগঠিত করা, বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা, নিরক্ষরতা, দূরীকরণ, স্বাস্থ্য রক্ষা, নেতৃত্বের বিকাশ ও গবেষণা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন জনগণের কল্যাণে ব্র্যাক বাস্তবমুখী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে যেমন- গ্রামীণ ঋণদান কর্মসূচী, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী, ব্র্যাক ব্যাংক, স্বাস্থ্য কর্মসূচী, খাবার স্যালাইন শিক্ষা কর্মসূচী, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম, আইনভিত্তিক সেবা কর্মসূচী, শিক্ষামূলক কর্মসূচী, হাওর গ্রাম প্রকল্প, মানিকগঞ্জ প্রকল্প, জামালপুর প্রকল্প, গবেষণা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্র্যাকের পটভূমি লিখুন।
২. ব্র্যাক কী?
৩. ব্র্যাকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। বাংলাদেশে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জনাব _____ যিনি পেশায় একজন _____।
২। ইজঅঈ বাংলায় যা _____ তথা সংক্ষেপে ___নামে পরিচিত।

উত্তরমালা

পাঠ ৫.১	টিক (√) চিহ্ন	১। (খ) ২। (ঘ)
পাঠ ৫.১	শূন্যস্থান	১। ২০ ২। ০১, ৬ , মহিলা, শিশু ৩। ৮৫০ ৪। ১৩৫
পাঠ ৫.২	টিক (√) চিহ্ন	১। (ঘ) ২। (খ)
পাঠ ৫.৩	সত্য মিথ্যা	১। স ২। মি ৩। স
পাঠ ৫.৪	শূন্যস্থান	১। জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডা. মোঃ ইব্রাহিম, ১৯৫৬ , ১ , ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন অব পাকিস্তান। ২। ২৬, জাতীয় কাউন্সিল ৩। সারাদেশে,৪১ ৪। খাদ্যাভ্যাস, পেশাগত কাজের ধরন, মানসিক দুশ্চিন্তা, পরিবেশ, বংশগতি ৫। আজীবনের রোগ, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ঔষধ সেবন, নিয়মানুবর্তিতা, খুব ভালভাবে।
পাঠ ৫.৫	শূন্যস্থান	১। ১৯১৮, এ্যানিবেসান্টের ২। কোপেনহেগেনে পঁচিশতম , বিশ্ব স্কাউট, আনুষ্ঠানিক।
পাঠ ৫.৬	টিক (√) চিহ্ন	১। (গ) ২। (ক)
পাঠ ৫.৭	সত্য মিথ্যা	১। মি ২। স
পাঠ ৫.৮	শূন্যস্থান	১। ফজলে হাসান আবেদ, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট ২। বাংলাদেশ পল্লী প্রগতি পরিষদ, ব্র্যাক

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বেসরকারী স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা সংস্থার পটভূমি লিখুন।
২. বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম বর্ণনা করুন।
৩. বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির কার্যক্রম বর্ণনা করুন।
৪. বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতির কার্যক্রম সমূহ লিখুন।
৫. বাংলাদেশ স্কাউট সমিতির কার্যক্রম লিখুন।
৬. বাংলাদেশ গার্লস গাইড সমিতি কার্যাবলী লিখুন।
৭. গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
৮. ব্র্যাকের কার্যক্রমসমূহ আলোচনা করুন।